সুন্দরবনে একদিন

সিকদার মনজিলুর রহমান

চাঁদপাই রেঞ্জ অফিস,করমজল

দীর্ঘদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের আটলান্টায় পরবাসী। গত ১২ মে মায়ের অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে এক রকম হঠাৎ করেই দেশে গিয়ে পৌঁছালাম। স্বদেশে বেড়াতে গেলে স্বভাবত সৌজন্য সাক্ষাতে অনেকেই সাক্ষাৎ করতে আসেন। এমনি একদিন স্বপরিবারে সাক্ষাৎ করতে এলো বড় বোনের ছোট ছেলে কামরুল ইসলাম। সে মংলায় একটি এনজিওতে চাকরি করে। কথার ফাঁকে মংলায় তার বাসায় যাবার আমন্ত্রণ জানাল। প্রাথমিকভাবেই বলে ফেললাম, না । পরে সে আবারও জানাল,তার বাসা থেকে সুন্দরবন বেশ একটা দূরে নয় , গেলে সুন্দরবনে বেড়িয়ে আসা যেতে পারে। বঙ্গোপ সাগরের সৈকতে সাগরের নোনা পানির ধোঁয়ায় হযরত খান জাহান আলির (রাঃ) পূণ্যভূমি বাগেরহাট । দক্ষিণবঙ্গের এই বাগেরহাট জেলায়ই আমার জন্ম। আমার সেই জন্মভূমিতেই রয়েছে বিশ্ববিখ্যাত ম্যানগ্রোভ বনভূমি সুন্দরবন। নাগালের মধ্যে এমন একটি বিখ্যাত পর্যটন ভূমি থাকা সত্ত্বেও কখনও যাওয়া হয়নি। তাই সুন্দরবন বেড়ানোর প্রসঙ্গ আসতেই আমার সিদ্ধান্তের পরিবর্তন করে ফেললাম। জবাব দিলাম, যদি সুন্দরবন ভ্রমণে নিয়ে যাও তবে যাওয়া যেতে পারে।

সুন্দরবন বঙ্গোপ সাগর সমুদ্র উপকূলবর্তী লবণাক্ত পরিবেশে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের বদ্বীপ এলাকায় অবস্থিত বিশ্বের সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বনভূমি । বাংলাদেশের সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাট জেলার অংশ বিশেষ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কিছু অংশ নিয়ে সুন্দরবন বিস্তৃত । পরস্পর সম্পর্কযুক্ত প্রায় চার শ' নদী-নালা, খালসহ প্রায় দু'শ ছোট বড় বদ্বীপ জালের মত ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সুন্দরবনে।আজ থেকে প্রায় ২০০ বছর আগেও মূল সুন্দরবনের আয়তন ছিল ১৬,৭০০ বর্গ কিলোমিটার। বর্তমানে সংকুচিত হয়ে প্রকৃত আয়তনের এক-তৃতীয়াংশে এসে পৌঁছেছে। ব্রিটিশ ভারত বিভাগের পর বনের দুই-তৃতীয়াংশ পড়ে আমাদের ভূখন্ডে বাকিটা ভারতের।এই বনভূমির বর্তমান আয়তন হবে প্রায় ৬,০১৭ বর্গ কিলোমিটার এর ১,৩৯৭ বর্গ কিলোমিটার জলাভূমি।স্বনামে বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার ছাড়াও নানান ধরণের পাখি, চিত্রা হরিণ, রেসাস বানর, বন বিড়াল, বন মোরগ, বন্য শূকর, কুমির ও সাপসহ অসংখ্য প্রজাতির পশু-পাখির বিচরণ ক্ষেত্র এই বনভূমি। সাম্প্রতিক কালের এক জরিপ থেকে জানা যায়, ছোট-বড় মিলে শ' পাঁচেক বাঘ , দেড় লাখের কাছাকাছি চিত্রা হরিণ, চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার বানর , বিশ-পঁচিশ হাজার বন্য শূকর, সমসংখ্যক ভোঁদর বসবাস করে সুন্দরবনে। বনবিভাগের হিসেব অনুযায়ি বছরে

করমজল ফরেস্ট পার্ক প্রবেশ পথ

১,১৬,৯৯০ জন দেশি-বিদেশী পরিব্রাজক আসেন সুন্দরবনে।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ি ২৬ মে বিকালে মংলায় ভাগ্নে কামরুলের বাসায় গিয়ে পৌছলাম। সঙ্গে বড় ভাই মুজিবর রহমানের যাওয়ার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত তিনি যেতে পারলেন না। ভাগ্নে কমরুলের ছোট সংসার, স্বামী-স্ত্রী ও একমাত্র ছেলে সেজান।

২৭ মে সকাল সাড়ে আটটায় আমি ,কামরুল, কামরুলের স্ত্রী হোসনে আরা সাথী ও সেজান সমভিব্যহারে সুন্দরবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলাম। সেজান মানে আমার নাতি যে ছিল আমার ভ্রমণ বিলাসের কথার সাথী। তিন বছর বয়সের নাতি যার পাক্কাপাক্কা কথা । প্রতিটি ব্যাপারে তার কৌতুহল। আমরা যখন করমজল ফরেস্ট পার্কে প্রথম বানর দেখলাম সে আমাকে জিজ্ঞেস করল ভাইয়া, বানরেরা রাতে কোথায় থাকে ? ওরা কি খায় ? কে তারের খেতে দেয় ? আরো কত শত প্রশ্ন ? করমজল টাওয়ারটা দেখে জিজ্ঞেস করল ঐ ঘরটা অত উচু কেন ? আমি উত্তর দিলাম ওটাকে বলে টাওয়ার। সেখান থেকে জঙ্গলের অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। সে টেনে টেনে বলল, ,’’টা-উ-য়ার ?’’ চলেন আমরা টাউয়ারে যাই।তার সে কথার ভঙ্গি শুনে আমাদের সাথের অন্যান্য ভ্রমণকারীরা তো হেসে লুটোপুটি।এমনি নানান কথায় , নানান প্রশ্নে সারাটা ভ্রমণ পথ আমাদের আনন্দ দিয়েছে। সে সাথে না থাকলে সুন্দরবন ভ্রমণটাই যেন আনন্দময় হত না।যাই হোক, কামরুলের মোটর সাইকেলে চড়ে আমরা মংলায় পশুর নদীর ঘাটে পৌছিলাম। পার্শ্ববর্তী গ্যারেজে সাইকেলটি রেখে আমরা ট্রলারে চাপলাম। ট্রলার আগেভাগেই ভাড়া করা ছিল। প্রায় আড়াই ঘন্টা পশুর নদীতে ট্রলার চালিয়ে আমারা চাঁদপাই রেঞ্জের করমজলে পৌছলাম। মংলা থেকে সুন্দরবন যেতে করমজলই সবচেয়ে কাছে। মংলা বন্দরের মংলা নদী থেকে পশুরে পড়তেই চোখে পড়ল বনশ্রী সুন্দরবন। মাঝে-মধ্যে দু’একটা জেলে নৌকা । বেশ বড় সর একটি বিদেশী জাহাজ দেখলাম ধেয়ে আসছে বোধহয় মংলা বন্দরে নোঙর করবে।চারপাশে থরে থরে সাজানো বনভূমি। এমন নয়নাভিরাম দৃশ্য যা কখনও ভোলার নয়। মনে হয় এমনই কোন এক সন্ধিক্ষণে কবি গাহিয়াছেন, ‘’ এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি, সকল দেশের সেরা সে যে আমার জন্মভূমি।’’ ট্রলারের উপর থেকেই সেই নয়নাভিরাম দৃশ্যের কয়েকটা ছবি তুলে ফেললাম।

চাঁদপাই রেঞ্জের করমজল অফিসে বনে প্রবেশের যাবতীয় কার্যাদি সম্পন্ন করে ভাবছি আমরা কি ঠিক তখনই বনে ঢুকব না পরে ঢুকব ? কামরুল বলল, ‘মামা এখানে একটা ফরেস্ট

পার্ক আছে চলেন পার্কটা ঘুরে আসি।'

হাত তিনেক চওড়া কাঠের ব্রীজ বনের ভিতর চলে গেছে প্রায় আধা মাইল দক্ষিণ দিকে পশুর নদীর তীর পর্যন্ত। কিছুদূর যেতেই ব্রীজ দুইদিকে ভাগ হয়ে গেছে, ব্রীজের শেষ দুই প্রান্তে গোলাকার দু'টো বিশ্রামাগার যার চারিদিকে গোল করে বসানো রয়েছে বসবার বেঞ্চ। এই ব্রীজে যেতে যেতে চোখে পড়ল অসম্ভব সুন্দর গোলাপী রঙের ছোট ছোট কাঁকড়া । কাদা মাটির গর্তের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে আবার পালিয়ে যাচ্ছে। আমার ঠিক তখনই মনে পড়ল আটলান্টায় জর্জিয়া এ্যাকুরিয়ামে আমরা যেসব রঙ বেরঙের কাঁকড়া দেখেছিলাম সেখানকার কাঁকড়াগুলো এ রূপসী কাঁকড়ার কাছে কিছুইনা। এ কাঁকড়রগুলো আটলান্টায় নিয়ে গেলে মনে হয় জর্জিয়া এ্যাকুরিয়াম কর্তৃপক্ষ এ্যাকুরিয়ামের শোভা বর্ধনে সাদরে গ্রহণ করবে এবং পরিচয় বোর্ডে লেখা থাকবে বাংলাদেশের নাম। যেমনটি আটলান্টা চিড়িয়াখানায় পৃথিবীর হাজারো প্রাণীর মাঝে মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে আছে সুন্দরবনের বিশ্ব বিখ্যাত বাঘ 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার' বা বেঙ্গল টাইগার । বিদেশী প্রতিষ্ঠানে স্বদেশি কিছু দেখলে গর্বে মনটা ভরে যায়। আমরা যখন ব্রীজ ধরে এগিয়ে যাচ্ছিলাম তখন কয়েকটি ক্ষুধার্ত বানর আমাদের পিছু নিল।লাঠি উঁচিয়ে তাড়া করলে ব্রীজ থেকে লাফ দিয়ে গাছের ডালে গিয়ে বসে। আবার পিছু নেয় । ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলতে গেলে ক্যামেরার সামনে পোজ দিয়ে বসে।মনে হলো ক্যামেরা চিনে এবং নিত্যদিন সে বিভিন্ন ভ্রমণকারীর ক্যামেরার সামনে পোজ নিতে নিতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। আমাদের সাথে থাকা রুটি ও কলা কামরুল তাদের খেতে দিল। কলা বানরের প্রিয় খাদ্য।

বানরভায়ার ছবি তুলে সামনের দিকে এগোতেই হঠাৎ করে দু'জন লোক এসে বলল, 'আপনারা এখান থেকে ব্যস্ত এগিয়ে যান , প্লিজ । কারণ জানতে চাইলে আঙুল নির্দেশ করে দেখিয়ে বলল, ঐ যে দেখছেন মৌচাক ভাঙছে সেখান থেকে মৌমাছি ছুটে আসতে পারে। তাকিয়ে দেখলাম দু'জন লোক মৌচাক ভাঙার প্রস্ততি কল্পে গাছে চড়ছে। হাতে একটা মশাল। মশাল জ্বালিয়ে চাকে ধোঁয়া দিচ্ছে।

আমরা দ্রুত সামনে হেঁটে গিয়ে ব্রীজের শেষ প্রান্ত থেকে ডানদিকে বেঁকে যাওয়া মাটির সরু রাস্তা ধরে হেতাঁল বনের মধ্য দিয়ে বনের অনেক ভিতর ঢুকে পড়লাম। পরক্ষণে ভাবলাম, কোন নিরপত্তা প্রহরী ছাড়া বনের এত গহীনে আসা ঠিক হয়নি। পত্র-পত্রিকায় পড়েছি সুন্দরবনে অনেক বনদস্যু আছে। হঠাৎ যদি কোন বনদস্যু বা কোন হিংস্র প্রাণী আক্রমণ করে বসে তা হলে তা হলে তো বিপদ। যেহেতু আমাদের আত্নরক্ষা মূলক কোন ব্যবস্থাই নেই। ফিরে এলাম হেতাঁলবন থেকে।

হেতাঁল বন থেকে ফিরে অপর ব্রীজ ধরে চলে গেলাম তার শেষ প্রান্তে যা আবারও পশুর নদীর তীরে গিয়ে পৌঁছেছে । এ ব্রীজের শেষ প্রান্তেও রয়েছে একটি বিশ্রামাগার। সেখানে পরিচয় হলো কুমিল্লা থেকে আগত জনৈক মাহবুবের সাথে। তিনি খুলনা থাকেন । পরিবার-পরিজন নিয়ে বেড়াতে এসেছেন সুন্দরবনে

করমজল ফরেস্ট পার্ক ভ্রমণ শেষে গিয়ে উপস্থিত হলাম করমজল হরিণ ও কুমীর প্রজনন কেন্দ্রে। খাঁচার মধ্যে দেখা মিলল হরিণ ও অনেক কুমীরের সাথে। আগেই বলেছি এখানে একটা টাওয়ার রয়েছে , টাওয়ারে চড়ে সুন্দরবনের উপরিভাগ অনেকদূর পর্যন্ত দেখা যায়।

কথা হলো মাহবুব সাহেবের সাথে তিনি জিজ্ঞেস করলেন , আপনারা ভিতরে যাবেন না ?

যাব তো বটে ।

চলেন এক সাথে যাই।

ঠিক আছে , চলেন এক সাথে যাওয়া যাক।

তাদের ট্রলার ঘাটে রেখে আমাদের ট্রলারে বনের ভিতর ঢোকার সিদ্ধান্ত নিলাম। সঙ্গে যাবে আর্মসসহ একজন গাইড। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা সুমতি পৌছলাম। সুমতির সঙ্গি এখানে বেতমোর খাল। কোথাও জনমানব নেই। মাঝে-মধ্যে দু'একটা জেলে নৌকা দেখা যাচ্ছে । চারপাশে থরে থরে সাজানো বনভূমি। একে তিন টুকরায় ভাগ করেছে বন বিভাগ। শরণখোলা জোন হচ্ছে গ্রিন জোন। এটি সুন্দরবনের অভয়ারণ্য। খুলনা অংশে হিরণ পয়েন্ট। আর সাতক্ষীরায় পড়েছে রেড জোন। ৬ হাজার ১৭ কিলোমিটার মাটিতে জুড়ে থাকা এই সবুজের মেলায় এলোমেলো বিলি কেটে বয়ে গেছে

রেসাস বানর ছবিঃ কামরুল

হেতাঁল বনে লেখক ছবিঃ কামরুল

ছোট-বড় নদ-নদী, খাল। নদীর পাশ ঘেঁষে সুন্দরি, গেওয়া, কেওড়া,ধুন্দল, গোলপাতা আর কত শত চেনা-অচেনা বৃক্ষরাজি। গোলপাতা গোল না মোটেও দেখতে অনেকটা নারকেল পাতার মত তবে গাছ কিন্তু নারকেল পাতার মত নয়।ঘর- গৃহস্থলির কাজ ও চাল ছাওয়ার কাজে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে লোকেরা ব্যাপকহারে এই গোলপাতা ব্যবহার করে।

আমাদের ট্রলার কচিখালির তীরে শরণখোলা রেঞ্জে এসে পৌঁছিল।করমজলের মত এখানেও রেঞ্জ অফিসের পাশে বানানো হয়েছে ফরেস্ট পার্ক। কচিখালি অভয়ারণ্য নামে পরিচিত। কোন নির্ভয় প্রাণির দেখা না পেলেও পরিচয় হলো নানা রঙের ব্যাঙের ছাতা বা ছত্রাকের । একে ইংরেজিতে বলে মসরুম। আমরা আমেরিকায় ব্যাঙের ছাতা বা মসরুম খেয়ে থাকি। তবে এসব ব্যাঙের ছাতা খাওয়া যায়না। এগুলো বিষাক্ত। রেঞ্জ অফিসের পাশে পানীয় জলের জন্য ছোট বড় কয়েকটি পুকুর । রঙ বেরঙের শাপলা ফুল ফুটে আছে সেখানে। পুকুরের এক কোনায় কতগুলো বুনোহাঁস জলকেলি করছে। এর পাশেই ডেমের চর। এই চরটা উপর থেকে দেখতে ঠিক ডিমের মত। বোধ এর জন্যই এর নাম দিয়েছে ডেমের চর।এই চরেও দেখা পেলাম রঙ বেরঙের কাঁকড়া কূলের। আর আছে অচিন কিছু জংলি ফুলের লতাবাহার।

ছোট-বড় নদ-নদী। নদীর পাশ ঘেঁষে সুন্দরি, গেওয়া, কেওড়া, ধুন্দল, গোলপাতা আর কত শত চেনা-অচেনা বৃক্ষরাজি। গোলপাতা গোল না মোটেও। দেখতে অনেকটা নারকেল পাতার মত তবে গাছ কিন্তু নারকেল পাতার মত নয়। ঘর-গৃহস্থলির কাজ ও চাল ছাওয়ার কাজে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে লোকেরা ব্যাপক ব্যবহার করে এই গোলপাতা।

কচিখালি ফরেস্ট পার্ক ছেড়ে আমরা ছুটলাম জামতলা বীচে। জামতলা বীচ হয়ে বন ভেদ করে জামতলা ঘাটে যাব। বলা যায় কটকায় যাব। কটকা বনরাজ রয়েল বেঙ্গল টাইগারের রাজবাড়ি। তিনি এখানে থাকেন। জামতলা বীচের কাশবনের সরু পথে পায়ে হেঁতে চলছি। আমার নাতি সেজান আর হাঁটতে পারছে না। একবার তার মা একবার তার বাবা তাকে কোলে তুলে হাঁটছে । আমিও তাকে একবার ঘাড়ে নিলাম । তার মা কামরুলের দিকে তাকিয়ে বলল, মামা মোটা মানুষ এমনিতেই ঘেমে গেছেন। তাঁর কষ্ট হবে , তুমিই ওকে নাও। আমি হেসে জবাব দিলাম ,না অসুবিধা হবে না। তুমি হাঁটো তো বাপু । মাহবুব সাহেব সেজানের দিকে তাকিয়ে বলল , আমার কোলে আসবে তুমি ? সে ঘাড় নেড়ে জবাব দিল , না। গাইড সতর্ক করে দিলেন কেউ যেন একা একা তীরে না যাই। সবাই একসঙ্গে থাকবেন।জামতলা বীচের আরেক নাম চোরাবালির ফাঁদ। এ ফাঁদে পরেই খুলনা ভার্সিটির একদল শিক্ষার্থী হারিয়ে গিয়েছিল বালুর তলে। এখনও সেখানে তাদের নামাংকিত সতর্কবার্তা সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আরো একটু এগোতেই সুন্দরির দেখা পেলাম। সঙ্গে ম্যানগ্রোভ শুল। সাদা বালুর বুকে কালো কালো শূল। সব কিছুতেই যেন বেহিসেবী শিল্পের ছোঁয়া।কোথাও কেওড়া, কোথাও সুন্দরির মায়া-ছায়া-কায়ার খেলা। পথে ধুন্দল-আবলুসের ফাঁক গলে কোথাও হরিণ উঁকি দিল। কোথাও দেখা গেল বানরের দল। সঙ্গে অজানা-অচেনা পাখির ডাক। সেখানে বন বেশ ঘন।মাটি স্যাঁতস্যাতে কেমন যেন ভেজা ভেজা গন্ধ। গাইড ভাই বললেন যেসব জায়গায় জলাভূলি আছে সেখানে কুমির থাকে। বর্ষায় পানি জমলে হাঁটু ডোবা জলে ব্যাঙেরা এসে জড় হয়ে বীজ বোনে নতুন প্রজন্মের। আর সেই ব্যাঙের লোভে অজগর এসে ঠাঁই নেয় সেখানে ।এখন বর্ষা শেষ বলেই তাদের দেখা পেলাম না। সবার সামনে থ্রি-নট-থ্রি রাইফেল হাতে গাইড প্লাস সিকিউরিটি সাহেব । গাইডের কড়া নির্দেশ কথা বলা যাবে না।সবাই তাকাবে কেবল সামনের দিকে। ভুলেও নীচে পায়ের দিকে চোখ ফেলা যাবে না।হঠাৎ ভুল কিছু দেখে চিৎকার দিলে পুরো দলের জন্যই হিতে বিপরীত হতে পারে। এই বন পেরুলেই জলাভূমির পাশে খানিকটা ফাঁকা জায়গা আর খোলা আকাশ। ঘন ঘাস খেতে সেখানে দল বেঁধে চিত্রারা আসে। হঠাৎ কারো চিৎকার

শুনে ভয় পেয়ে উল্টো-পাল্টা দৌঁড় দেয় এরা। এ কারণেই এখানে আমাদের কথা বলতে বারণ। ঘনবন ছাড়িয়ে আবার বুক সমান ঘাসের এলোপাথারি হাঁটা পথ। পুরো ভ্রমণপথে সবার আফসোস বনরাজের দেখা পেলাম না। বনের আলো-আঁধারি পথ পেরোতেই ফিসফিসিয়ে চাপা স্বরে আবারও সে আফসোস–ধুর বনবিচরণ প্রায় শেষ । যার রাজ্যে বেড়াতে এলাম সেই বনরাজ রয়েল বেঙ্গল কই?

আমাদের উল্টোদিকে পথ ধরে আসছে আরো একটি দল। সেদলে আবার বিদেশীরাও আছেন। আরো একটি দল পাশ কাটাতে দেখে কারও কারও গলায় জোর ফিরে এলো। পথের পাশে হলুদে ফুলের ঘন ঝোপ। তাতে অসংখ্য রঙিন প্রজাপতি। কাঠকুড়ালি আর মাছরাঙার সঙ্গে ফিঙে পাখির দেখা পেলাম। আমাদের সাড়া পেয়ে বনমুরগী একটা দৌড় দিয়ে বনের গহীনে লুকালো। হাঁটতে হাঁটতে সবাই ক্লান্ত। তবুও হাঁটছি । সামনেই টাওয়ার। আমরা সেদিকেই যাচ্ছি। পথচলা গিয়ে থামল চারতলা কাঠের টাওয়ারের গোড়ায়। ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে টাওয়ারের মাথায় উঠলাম পাখির চোখে সুন্দরবন দেখতে। সবুজের কত রঙ ! একই বন। সবাই গাছ। সবার পাতাই সবুজ। তবু সবুজের কত নমুনা। হঠাৎ কানের কাছে সাথী ফিসফিসিয়ে উঠল, ডান দিকে তাকান মামা। হরিণের পাল। কামরুলও তাকালো সেদিকে। কামরুল তর্জনী উঁচিয়ে সেজানকে দেখাল ,ঐ যে দেখ হরিণ। একদম কথা বলবে না । তাহলে ওরা পালিয়ে যাবে। সে বলে উঠল, ওগুলো হরিণ না, ছা-গ-ল। তার সে কথার ভঙ্গি শুনে টাওয়ার শুদ্ধ মানুষগুলো দম ফাঁটিয়ে হাসতে গিয়েও হাসতে পারলনা। যে যার বুকে চেপে রাখল। শিশুরা যা দেখে এবং যা ভালো বুঝে তাই-ই বলে ফেলে । আমার ঠিক সে মূহূর্তে মনে পড়ল , আমি তখন কলেজে পড়ি । আমাদের বেশ কয়েকটা ছাগল ছিল। সেজানের মেজো চাচা মিঠু আমার আরেকটা ভাগ্নে। বর্তমানে সে মালায়েশিয়া আছে।আমাদের বাড়ি বেড়াতে এসেছে । তার বয়স তখন ঠিক সেজানের বয়সি। একদিন সকাল বেলা তাকে কোলে নিয়ে ছাগল ছাড়তে গিয়েছি , তখন সে আমাকে জিজ্ঞেস করল, মামা এগুলো কি বরু ? অর্থাৎ গরু । আর আজ তারই ভাতিজা সেজান হরিণকে বলছে ছাগল। এক পাল হরিণ কেউ ঘাসে মুখ ডুবাচ্ছে, তো কেউ থ মেরে তাকিয়ে আছে । কারও কারও আবার খেলার নেশা- গুতোগুতি করতে করতে দে'ছুট। কয়েকজন হঠাৎ দু'পায়ে দাঁড়িয়ে কেওড়ার পাতা খাচ্ছে। বনের রাজ্যে এরা সবাই রাজা। ক'জনার আবার শিংয়ের বাহার আছে দেখছি! সবাই চিত্রল। তারপরও যেন একজন আরেকজনের চেয়ে সুন্দর। শুরু হলো ছবি তোলা। ক্লিক ক্লিক ক্লিক ...।

দেখতে দেখতে বেলা শেষ । বনরাজ রয়েল বেঙ্গল টাইগারের দেখা পেলাম না। গাইড সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম, এত বন চড়িয়ে এলাম বনরাজের দেখা মিললনা তা কেমন করে হয় ? তিনি বললেন ,আচ্ছছা। আরেকটা জায়গা আছে । চলেন সেদিকে যাই । দেখা মিলতেও পারে। আমরা কটকা ফরেস্ট জোনে যাবার জন্যে ট্রলারে চেপে বসলাম সারি সারি কেওড়া গাছ মাথা উঁচু করে দাড়িয়ে আছে। জোয়ারের পানি তখনও বন থেকে নামছে। হাঁটু অব্দি কাদা মাড়িয়ে আমরা হাটছি বনরাজের খোঁজে। সামনে একটা উঁচু ভিটা। এখানেই বনরাজ মাঝে-সাঝে ন্যাপ নিয়ে থাকেন। গাছের গায়ে পেরেক ঢুকে সাইন বোর্ডে লেখা- ' সাবধান। বাঘের বিচরণ

এলাকা।' আমরা সাবধানেই এগোচ্ছি। হাঁটতে হাঁটতে গাইড হঠাৎ থেমে গিয়ে এদিক সেদিক তাকাতে লাগলেন। তার এই আচমকা থেমে যাওয়া এবং বিহবল অবস্থা দেখে আমরাও সবাই ভরকে গেলাম। মাহবুব সাহেব তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কোন অশনি সংকেত ? তিনি জবাব দিলেন না তেমন কিছু নয়। আমরা যাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম তিনি এখানে ছিলেন । কিছুক্ষণ আগে এ স্থান ত্যাগ করেছেন। আঙুল নির্দেশ করে দেখালেন ঐ যে দেখেন তার পায়ের ছাপ । সে যে কিছুক্ষণ পূর্বে ভিটা থেকে নেমে গেছে তা পরিস্কার বোঝা গেল । পায়ের ছাপের স্থানের ঘাসগুলো তখনও সোজা হয়ে উঠেনি । কোন কোন গর্ত পানিও পরিপূর্ণ হয়নি। আমি ভরকে গেলাম। কামরুল ও বৌমার দিকে তাকিয়ে দেখি তাদের মুখও শুকিয়ে গেছে। যার সন্ধানে আমরা বন থেকে বনান্তরে খুঁজে ফিরছি তারই আর্বিভাব জেনে আমরা আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম। আমি গাইডকে জিজ্ঞাস করলাম, সেকি আসে পাশে কোথাও থাকতে পারে ?তিনি জবাব দিলেন, মানব জাতি আশরাফুল মকলুকাত অর্থাৎ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব।এ জাতিকে প্রতিটি জীবই ভয় পায়। আমার মনে হয় আমাদের আগমনের সাড়া পেয়ে সে স্থান ত্যাগ করেছে।

বনরাজ বিচরণের সাম্ভাব্য সব ক'টি স্থানই দেখা হয়ে গেল। কিন্তু কোথাও তার দেখা পেলাম না। আমরা সামনের দিকে আরো এগোব কি-না ভাবছি। গাইড বললেন, এই কাদায় হাঁটাই মুশকিল । হঠাৎ বাঘের সামনে পড়লে দৌড় দেবারও জো থাকবে না । আরো সাথে রয়েছে বাচ্চা-কাচ্চা।সে যদি মনে করে আমরা তাকে ফলো করছি তবে রাগ করে আক্রমণ করে বসতে পারে। তার কথার ইঙিতে বুঝতে পারলাম তিনি আর সামনের দিকে এগোতে চান না। আমরা এমনিতেই ভয় পেয়ে গেছি।তাই তার যুক্তিকে সমর্থন দিয়ে আমরা আর সামনের দিকে এগোলাম না।

সূর্যি ডোবার আর বেশি দেরী নাই। এবার ঘরে ফেরার পালা। ফিরব আবার সেই করমজল ফরেস্ট পার্কে।।এখানে নামিয়ে দিতে হবে মাহবুব সাহেবের পরিবারকে।অভয়ারণ্য ফরেস্ট জোন কটকা থেকে ফিরতে আবারও চোখে পড়ল সারি সারি হরিণের পাল। খালের পাড়ে নির্ভয়ে ঘাস খাচ্ছে। আমাদের দেখে কেউ তাকিয়ে থাকল, কেউ কেউ ভো দৌড় দিয়ে ঢুকে গেল বনের গহীনে। আমরা তীরে না উঠে এগোলাম খাল বেয়ে। গাছ ভর্তি বকের পাশেই হাঁটু ডুবিয়ে বসে আছেন সারস মশায়। আরো কিছুটা এগুতেই ভেংচি কাটল ৩/৪টি বানর। অসংখ্য নাম না জানা পাখি আর গোলপাতার ঘন বন সুন্দরবন। জীবনের প্রথম দেখলাম গোলগাছের অদ্ভুত ফল। যেন অষ্টধাতুতে গড়া কোনো শিল্পকর্ম।

মাহবুব সাহেবদের নামিয়ে দিয়ে আমাদের ট্রলার করমজল থেকে মংলার উদ্দেশ্যে সুন্দরবন ত্যাগ করল।দূর থেকে দেখতে পেলাম মংলা বন্দরের সান্ধ্য বাতিগুলো দপ করে জ্বলে উঠছে। নদীর পাশ ঘেঁসে ট্রলারটি আস্তে আস্তে মংলার দিকে এগিয়ে চলল আর পিছনে পড়ে থাকল বিশ্ববিখ্যাত ম্যানগ্রোভ বনভূমি সুন্দরবন । সুন্দরবনের জীব-জানোয়ার পক্ষীকূল লতা-পাতা গুল্ম সন্ধ্যা মলয়ে মাথা নেড়ে নেড়ে আমাদের জানালো বিদায় বার্তা, 'খোদা হাফিজ হে প্রবাসী ! আবার এসো এই গহীন অরণ্যে বাংলার জাতীয় পার্ক বনশ্রী সুন্দরবনে।'

আটলান্টা
০৭/২৪/১১